নয়টি প্রশ্নের উত্তর

মূল : মুহাম্মাদ নাছেরুদ্দীন আলবানী (রহঃ)

অনুবাদ : মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

প্রকাশক : **হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ**
কাজলা, রাজশাহী-৬২০৪
হা.ফা.বা. প্রকাশনা-৩২
ফোন ও ফ্যাক্স (অনুঃ) : ০৭২১-৮৬১৩৬৫, ৭৬০৫২৫

تسعة أسئلة مع الأجوبة

تأليف: محمد ناصر الدين الألبانى رحمه الله

الترجمة البنغالية : د. محمد أسد الله الغالب

الناشر: حديث فاؤنديشن بنغلاديش

(مؤسسة الحديث بنغلاديش للطباعة و النشر)

১ম প্রকাশ : আগষ্ট ২০১০ খৃষ্টাব্দ
ভাদ্র ১৪১৬ বঙ্গাব্দ
রামাযান ১৪৩১ হিজরী

কম্পোজ : **হাদীছ ফাউণ্ডেশন কম্পিউটার্স**

মুদ্রণ : সোনালী প্রিন্টিং এণ্ড প্যাকেজিং লিঃ, সপুরা, রাজশাহী, ফোন : ৭৬১৮৪২।

নির্ধারিত মূল্য : ১৫ (পনের) টাকা মাত্র।

Muhammad Naseruddin Albani, **Nine Questions & its answers**, Translated into Bengali by **Dr. Muhammad Asadullah Al-Ghalib**. Professor of Arabic, University of Rajshahi, Bangladesh. Published by: **HADEETH FOUNDATION BANGLADESH**. Kajla, Rajshahi, Bangladesh. 1431 A.H/2010 A.D.

সূচীপত্র

	বিষয়	পৃষ্ঠা

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمده ونصلى على رسوله الكريم

ভূমিকা

সিরিয়ার যুগশ্রেষ্ঠ হাদীছ বিশারদ পণ্ডিত এবং ছহীহ হাদীছ সমূহকে বাছাই করে একত্রিতভাবে জগত সমক্ষে তুলে ধরার অনন্য কৃতিত্বের অধিকারী মুহাদ্দিছ নাছেরুদ্দীন আলবানী (১৯১৪-১৯৯৯) শিষ্যদের ৯টি প্রশ্নের বাণীবদ্ধ জওয়াব দিয়েছিলেন। যা তাঁর সংযুক্তি ও অনুমতিক্রমে প্রথম পুস্তিকাকারে প্রকাশ করে জর্ডানের রাজধানী আম্মানের 'আল-মাকতাবাতুল ইসলামিয়াহ' নামক প্রতিষ্ঠান ১৪২১ হিজরী সনে (২০০১খৃঃ)। আমরা তাদের শুকরিয়া আদায় করছি।

প্রশ্ন এবং উত্তরগুলি অত্যন্ত শিক্ষণীয় ও গুরুত্বপূর্ণ বিবেচিত হওয়ায় **মাননীয় পরিচালক** কারাগারে থাকতেই যে প্রায় পাঁচ হাযার পৃষ্ঠার বিশাল পাণ্ডুলিপি রচনা করেন, তন্মধ্যে 'ইনসানে কামেল', ২৫ জন নবীর কাহিনী, পবিত্র কুরআনের কয়েক পারা-র তাফসীর, মিশকাতের প্রথম কয়েকটি অধ্যায়ের অনুবাদ ও ব্যাখ্যার সাথে সাথে অত্র বইটির অনুবাদও সমাপ্ত করেন। যা পরে **মাসিক আত-তাহরীক** অক্টোবর-ডিসে'০৯ পরপর তিন সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। এক্ষণে আমরা তা বই আকারে প্রকাশ করতে পেরে আল্লাহ্র শুকরিয়া আদায় করছি। যাতে সর্বস্তরের বাংলাভাষী পাঠক উপকৃত হন এবং মরহুম শায়েখ পরজগতে তাঁর ইলমী ছাদাক্বার নেকী লাভে ধন্য হন। আল্লাহ তাঁকে জান্নাতুল ফেরদৌসে স্থান দানে সম্মানিত করুন এবং মযলূম অনুবাদককে ইহকালে ও পরকালে উত্তম জাযা দান করুন- আমীন!

সচিব
হা.ফা.বা.

بسم الله الرحمن الرحيم

॥ প্রশ্নোত্তর সমূহ ॥

প্রশ্ন-১ : মাননীয় শায়েখ! আমরা একটি ছোট পুস্তিকায় একটি হাদীছ পাঠ করেছি। যেখানে বলা হয়েছে, خُذْ مِنَ الْقُرْآنِ مَا شِئْتَ لِمَا شِئْتَ 'তুমি কুরআন থেকে নাও যা তুমি চাও, যেজন্য চাও'। এ হাদীছটা কি ছহীহ? আমাদেরকে বুঝিয়ে বলুন! আল্লাহ আপনাকে উত্তম পুরস্কারে ভূষিত করুন!

উত্তর : হাদীছটি কিছু লোকের মধ্যে বহুল প্রচারিত। কিন্তু খুবই দুঃখের বিষয় যে হাদীছ শাস্ত্রে এর কোন ভিত্তি নেই।[১] অতএব এটা বর্ণনা করা এবং একে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর দিকে সম্বন্ধ করা জায়েয নয়। অতঃপর হাদীছটির বিস্তৃত অর্থ যা কিছুকে শামিল করে তা বিশুদ্ধ নয় এবং ইসলামী শরী'আতে তা আদৌ প্রমাণিত হয় না। যেমন ধরুন, আমি যদি আমার ঘরের আঙিনায় বসে থাকি এবং রূযির জন্য কোনরূপ কাজ না করি এবং আমি যদি আমার প্রভুর নিকটে খাদ্য প্রার্থনা করি যেন তিনি আমার উপরে আসমান থেকে তা নাযিল করেন। কেননা আমি কুরআন থেকে এটা নিয়েছি।-একথা কি কেউ বলবে?

এটি বাতিল কথা মাত্র। সম্ভবতঃ এটা কোন কর্মবিমুখ অলস ছূফীর তৈরী করা কথা হবে। যারা তাদের হুজরায় বসে থাকায় অভ্যস্ত হয়ে গেছে এবং একে তারা 'রিবাত্বাত' (الرِّباطات) বলে অভিহিত করে (বাংলাদেশে 'মোরাকাবা' বলে)। তারা সেখানে বসে থাকে আর আল্লাহ্র পাঠানো রূযির অপেক্ষা করতে থাকে, যা কোন লোক তার জন্য নিয়ে আসবে। অথচ এটি কোন মুসলিম ব্যক্তির স্বভাব হ'তে পারে না। কেননা রাসূলুলাহ (ছাঃ) মুসলমানদের গড়ে তুলেছিলেন উঁচু হিম্মত ও আত্মসম্মান বোধের উপরে। তিনি বলেছেন, اَلْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ من اليَد السُّفْلَى، فاليد العليا هى الْمُنْفِقَةُ واليد السفلى هى السَّائِلَةُ– 'উপরের হাত নীচের হাতের চাইতে উত্তম। উপরের হাত হ'ল ব্যয়কারী এবং নীচের হাত হ'ল সওয়ালকারী'।[২]

১. (لا أصل له فيما أعلم) *সিলসিলা যঈফাহ হা/৫৫৭।*
২. *বুখারী, হা/১৪২৯; মুসলিম হা/১০৩৩; মিশকাত হা/১৮৪৩ 'যাকাত' অধ্যায় ৪ অনুচ্ছেদ।*

কিছু কিছু দুনিয়াত্যাগী ও ছূফী ব্যক্তির বিস্ময়কর কেচ্ছা-কাহিনী আমরা শুনতে পাই। আমরা আলোচনা দীর্ঘ না করে উদাহরণ স্বরূপ একটা ঘটনা পেশ করতে চাই।

ছূফীদের ধারণা মতে তাদের একজন ব্যক্তি পৃথিবী ভ্রমণে বের হয় পাথেয়শূন্য অবস্থায়। কিন্তু খেতে না পেয়ে সে মরার উপক্রম হয়। এমতাবস্থায় সে দূরে একটি গ্রাম দেখতে পেল। অতঃপর সেখানে গেল। ঐদিন ছিল জুম'আর দিন। সে তার ধারণা অনুযায়ী যেহেতু আল্লাহ্র উপরে ভরসা করে সে সফরে বের হয়েছে এবং এই ভরসায় যাতে কোনরূপ কমতি দেখা না দেয়, সেজন্য সে নিজেকে লোকচক্ষুর আড়াল করে মিম্বরের নীচে লুকিয়ে রইল। তার অন্তর একথা বলছিল, যেন কেউ না কেউ তাকে বুঝে ফেলে। কিছু পরে খতীব খুৎবা দিলেন। কিন্তু ঐ ছূফী জামা'আতে ছালাত আদায় করল না। ইতিমধ্যে খতীব খুৎবা ও ছালাত শেষ করেছেন এবং মুছল্লী সবাই একে একে বের হ'তে শুরু করেছেন। লোকটি বুঝতে পারল যে, সম্ভবতঃ মসজিদ খালি হয়ে গেল। সত্বর দরজা সমূহ বন্ধ হয়ে যাবে এবং সে একাকী মসজিদে খানাপিনা ছাড়াই পড়ে থাকবে। তখন উপায়ান্তর না দেখে বেচারা ছূফী কাশি দিতে থাকলো। যাতে লোকেরা তার উপস্থিতি টের পায়। তার কাশির আওয়ায শুনে মুছল্লীদের দৃষ্টি পড়ল। দেখা গেল যে, সে ক্ষুধায়-তৃষ্ণায় হাড্ডিসার অবস্থায় পড়ে আছে। তখন তারা তাকে উঠিয়ে নিয়ে গেল ও খানাপিনার ব্যবস্থা করল। লোকেরা তাকে বলল, হে অমুক! তুমি কে? ছূফী বলল, أَنَا زَاهِدٌ مُتَوَكِّلٌ عَلَى اللهِ 'আমি একজন দুনিয়াত্যাগী, আল্লাহ্র উপরে ভরসাকারী'। লোকেরা বলল, তুমি কিভাবে বলছ আল্লাহ্র উপরে ভরসাকারী? অথচ তুমি মরতে বসেছিলে? যদি তুমি আল্লাহ্র উপরে ভরসাকারী হ'তে, তাহ'লে কারু কাছে চাইতে না। আর তোমার উপস্থিতি জানাবার জন্য কাশতে না। এভাবেই তোমার পাপে তুমি মরে যেতে'।

এটাই হ'ল দৃষ্টান্ত, যা এইসব জাল হাদীছের পরিণাম হিসাবে পরিদৃষ্ট হয়। মোট কথা এই হাদীছের কোন ভিত্তি নেই।[৩]

৩. *প্রিয় পাঠক! বাংলাদেশে প্রচলিত তাবীযের বইগুলি দেখুন। কুরআনের আয়াত ও সূরায় ভরা মাদুলীগুলো দেখুন। তাছাড়া মকছুদোল মুমেনীন, নেয়ামুল কোরআন প্রভৃতি বইগুলি দেখুন। কুরআনকে এরা ঔষধের কিতাব বানিয়ে ছেড়েছে। যা বিক্রি করে এরা দু'পয়সা রোজগার করছে। আর ঈমান হরণ করছে দৈনিক হাযার হাযার মুসলমানের। ইহুদী-নাছারা আলেম ও দরবেশরা তাওরাত-ইনজীলের শব্দ ও অর্থ বিকৃত করে জনগণের কাছে পেশ করত এবং তার*

প্রশ্ন-২ : জনাব! আহলে কুরআন (অর্থাৎ যারা কেবল কুরআন মানার দাবী করে, হাদীছ মানে না) যুক্তি দেয় যে, আল্লাহ বলেছেন, وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيْلاً 'প্রত্যেক বিষয় আমরা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছি' *(ইসরা ১৭/১২)*। **তিনি আরও বলেন, وَمَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ 'আমরা এই কিতাবে কোন কিছুই লিখতে ছাড়িনি'** *(আন'আম ৬/৩৮)*। **রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, إِنَّ هذا القرآنَ طَرَفُه بيد الله وطرفه بِأَيديْكم، فَتَمَسَّكُوْا به، فَإِنَّكُمْ لَنْ تَضِلُّوا وَلَنْ تَهْلِكُوْا بَعْدَهُ أَبَدًا– 'নিশ্চয়ই এই কুরআনের এক প্রান্ত আল্লাহ্র হাতে এবং অপর প্রান্ত তোমাদের হাতে। অতএব তোমরা একে কঠিনভাবে আঁকড়ে ধর। কেননা তোমরা এরপরে আর পথভ্রষ্ট হবে না এবং কখনোই ধ্বংস হবে না'।[৪] উপরোক্ত বিষয়গুলিতে আপনার পর্যালোচনা কামনা করছি।**

উত্তর : প্রথমতঃ وَمَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ 'আমরা এই কিতাবে কোন কিছুই লিখতে ছাড়িনি' এখানে 'এই কিতাবে' অর্থ 'লওহে মাহফূয' (اللوح المحفوظ)। কুরআনুল কারীম নয়। অতঃপর وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيْلاً 'প্রত্যেক বিষয় আমরা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছি'- যখন আপনারা এটাকে কুরআনের সঙ্গে যুক্ত করবেন, যার বর্ণনা পূর্বে চলে গেছে (অর্থাৎ আহলে কুরআন হওয়ার দাবী), তখন এর পূর্ণ অর্থ হবে এই যে, আল্লাহ প্রত্যেক বিষয় খোলাছা করে ব্যাখ্যা করেছেন। তবে অন্য সংযুক্তি সহকারে। কেননা আপনারা জানেন যে, ব্যাখ্যা অনেক সময় 'সংক্ষিপ্ত' (بالإجمال) হয়ে থাকে সাধারণ মূলনীতি সমূহ নির্ধারণের মাধ্যমে। যার অধীনে বহু শাখা-প্রশাখা থাকে, যা গণনা করে শেষ করা যায় না। বিজ্ঞ শরী'আত প্রণেতার পক্ষ হ'তে ঐসব শাখা-প্রশাখার জন্য স্পষ্ট মূলনীতি সমূহ দান করায় কুরআনের

বিনিময়ে দু'পয়সা রোজগার করত (বাক্বারাহ ২/৭৯)। যা আজও তারা করে যাচ্ছে। এযুগে আমাদের অবস্থা ইহুদী-নাছারা আলেম-দরবেশদের থেকে খুব বেশী ব্যতিক্রম নয়। পার্থক্য এই যে, কুরআন ও ছহীহ হাদীছ শাব্দিকভাবে অবিকৃত রয়েছে। কারণ আল্লাহ স্বয়ং এর হেফাযতের দায়িত্ব নিয়েছেন (হিজর ৯;ক্বিয়ামাহ ১৬-১৯)। -অনুবাদক।

৪. *ছহীহ তারগীব ১/৯৩/৩৫; ত্বাবারাণী, ছহীহ ইবনু হিব্বান।*

আয়াতের মর্ম প্রকাশিত হয়েছে। অতঃপর ব্যাখ্যা অনেক সময় 'বিস্তারিত' (بالتفصيل) হয়। আলোচ্য আয়াতের এরূপ অর্থের দিকেই মস্তিষ্ক দ্রুত ধাবিত হয়। যেমন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَا تَرَكْتُ شَيْئًا مِمَّا أَمَرَكُمُ اللهُ بِهِ إِلاَّ وَقَدْ أَمَرْتُكُمْ بِهِ وَلاَتَرَكْتُ شَيْئًا مِمَّا نَهَاكُمُ اللهُ عَنْهُ إِلاَّ وَقَدْ نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ– 'আল্লাহ তোমাদেরকে যা কিছু নির্দেশ দান করেছেন, তার কোন কিছুই আমি তোমাদের নির্দেশ দিতে ছাড়িনি এবং আল্লাহ তোমাদেরকে যা কিছু নিষেধ করেছেন, তার কোন কিছুই আমি তোমাদের নিষেধ করতে ছাড়িনি'।[৫]

এক্ষণে 'বিস্তারিত' কখনো মূলনীতি সমূহের মাধ্যমে হয়, যার অধীনে বহু শাখা-প্রশাখা থাকে এবং কখনো ইবাদাত ও আহকামের খুঁটিনাটি বর্ণনার মাধ্যমে হয়। যাতে কোন মূলনীতির দিকে ফিরে যাওয়ার প্রয়োজন হয় না। এক্ষণে যেসব মূলনীতির অধীনে বহু শাখা-প্রশাখা রয়েছে, যার মাধ্যমে ইসলামের বিরাটত্ব ও বিধান রচনার গণ্ডির ব্যাপকতা স্পষ্ট হয়, সেইসব 'সংক্ষিপ্ত মূলনীতির' (القواعد الإجمالية) কয়েকটি দৃষ্টান্ত স্বরূপ পেশ করা হ'ল। যেমন-

(১) لاضَرَرَ ولاضِرَارَ 'ক্ষতি নয়, ক্ষতি করা নয়।'[৬]

(২) كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ 'প্রত্যেক মাদক বস্তু মদ এবং প্রত্যেক মদ হারাম'।[৭]

(৩) كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ وَكُلُّ ضَلاَلَةٍ فِي النَّارِ 'প্রত্যেক বিদ'আত ভ্রষ্টতা এবং প্রত্যেক ভ্রষ্টতার পরিণাম জাহান্নাম'।[৮]

এই সকল মূলনীতি কোন কিছুকে ছেড়ে দেয়নি। যেমন প্রথমটি ব্যক্তিগত ক্ষতি এবং আর্থিক ক্ষতি সবকিছুকে শামিল করে। দ্বিতীয়টি মাদকতা সংশ্লিষ্ট সবকিছুকে শামিল করে। চাই সে মাদক আঙ্গুর থেকে হউক- যা খুবই প্রসিদ্ধ,

৫. *ইবনু খুযায়মাহ, হা/১০০; সিলসিলা ছহীহাহ হা/১৮০৩।*
৬. *মুওয়াত্ত্বা, ইবনু মাজাহ, ছহীহুল জামে' হা/৭৫১৭।*
৭. *আবুদাউদ হা/৩৬৭৯; ইরওয়াউল গালীল ৮/৪০/২৩৭৩; মুসলিম, মিশকাত হা/৩৬৩৮।*
৮. *ছহীহুত তারগীব ওয়াত তারহীব ১/৯২/৩৪; আলবানী, ছালাতুত তারাবীহ পৃঃ ৭৫; মুসলিম, মিশকাত হা/১৪১; নাসাঈ হা/১৫৭৯।*

চাই গম বা অন্য কোন উপাদান থেকে তৈরী হৌক। যতক্ষণ তা মাদক থাকবে, ততক্ষণ তা হারাম থাকবে। অনুরূপভাবে তৃতীয় মূলনীতিটি এত বেশী সংখ্যক বিদ‘আতকে শামিল করে, যা গণনা করে শেষ করা যাবে না। তবুও খুবই সংক্ষিপ্ত হওয়া সত্ত্বেও হাদীছটি স্পষ্ট করে বলে দিয়েছে যে, ‘প্রত্যেক বিদ‘আতই ভ্রষ্টতা এবং প্রত্যেক ভ্রষ্টতার পরিণাম জাহান্নাম’। এটা হ’ল বিস্তারিত ব্যাখ্যা। কিন্তু সেটা এসেছে মূলনীতি আকারে। অতঃপর বিস্তারিত বিধান সমূহ, যা আপনারা জানেন, যার অধিকাংশ হাদীছে একটি একটি করে উল্লেখিত হয়েছে এবং কখনো কুরআনেও বর্ণিত হয়েছে। যেমন উত্তরাধিকার বণ্টন নীতিমালা *(নিসা ৪/১১-১২)*।

অতঃপর প্রশ্নে যে হাদীছটির কথা বলা হয়েছে, হাদীছটি ছহীহ। তার উপরে আমাদের সাধ্যমত আমল করা উচিত। একই মর্মে আরেকটি হাদীছ এসেছে, যেমন রাসূলুলাহ (ছাঃ) বলেন, تَرَكْتُ فِيْكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوْا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا، كِتَابَ اللهِ وَسُنَّةَ رَسُوْلِه، ‘আমি তোমাদের মাঝে দু’টি বস্তু ছেড়ে যাচ্ছি। কখনোই তোমরা পথভ্রষ্ট হবে না, যতদিন এ দু’টি বস্তুকে তোমরা আঁকড়ে ধরে থাকবে। আল্লাহ্র কিতাব ও তাঁর রাসূলের সুন্নাহ’।[৯] এক্ষণে আল্লাহ্র রজ্জু ধারণ- যা আমাদের হাতে রয়েছে- তা হ’ল সুন্নাহ্র উপরে আমল করা, যা কুরআনুল কারীমের বিস্তারিত ব্যাখ্যাকারী।

প্রশ্ন-৩ : অনেকে বলেন, হাদীছ যখন কুরআনের কোন আয়াতের বিরোধী হবে, তখন সে হাদীছ অগ্রাহ্য হবে, যতই তা বিশুদ্ধ হৌক না কেন। যেমন একটি হাদীছে এসেছে, إِنَّ الْمَيِّتَ لَيُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِه عَلَيْه ‘পরিবারবর্গের ক্রন্দনে কবরে মাইয়েতের উপরে আযাব হয়’।[১০] হাদীছটির প্রতিবাদে হযরত আয়েশা (রাঃ) কুরআনের আয়াত পেশ করেছেন, وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ‘একের বোঝা অন্যে বইবে না’।[১১] এক্ষণে এর জওয়াবে কি বলা যাবে?

৯. *মুওয়াত্ত্বা, মিশকাত হা/১৮৬।*

১০. *ছহীহুল জামে‘ হা/১৯৭০; মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৭২৪, ‘জানাযা’ অধ্যায়* ‘মৃতের উপর ক্রন্দন’ অনুচ্ছেদ।

১১. *ফাত্বির ৩৫/১৮; আন‘আম ৬/১৬৪।*

উত্তর : হাদীছটিকে রদ করা কুরআন দ্বারা সুন্নাহকে রদ করার সমপর্যায়ভুক্ত। যা এ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়ার শামিল। এক্ষণে হাদীছটির জওয়াবে আমি বিশেষ করে ঐসব লোকদের বলব, যারা ‘হাদীছে আয়েশা’ থেকে দলীল গ্রহণ করেছেন- তা হ’ল এই যে, **প্রথমতঃ** হাদীছের দিক দিয়ে একে রদ করার কোন সুযোগ নেই দু’টি কারণে।- এক. হাদীছটি ছহীহ সনদে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে।

দুই. ইবনে ওমর একা নন। বরং তাঁর পিতা ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব এবং হযরত মুগীরাহ বিন শো‘বা (রাঃ) থেকে ছহীহায়নে উক্ত তিনজন ছাহাবীর বর্ণনা এসেছে। অতএব কেবল কুরআনের সাথে বিরোধ হওয়ার দাবী করে এ হাদীছকে প্রত্যাখ্যান করার সুযোগ নেই।

দ্বিতীয়তঃ ব্যাখ্যাগত দিক দিয়ে, বিদ্বানগণ হাদীছটিকে দু’ভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। এক- এ হাদীছ ঐ মাইয়েতের উপরে প্রযোজ্য, যিনি তার জীবদ্দশায় জানতেন যে, তার মৃত্যুর পরে তার পরিবারের লোকেরা শরী‘আত বিরোধী কাজকর্ম করবে। অথচ তিনি তাদেরকে সেগুলি না করার উপদেশ দিয়ে যাননি। ফলে তাদের বেশরা কান্নাকাটি উক্ত মাইয়েতের জন্য আযাবের কারণ হবে।

الميت শব্দের প্রথমে ال বৃদ্ধি দ্বারা সাধারণভাবে সকল মাইয়েতকে বুঝানো হয়নি। বরং কেবল ঐসব মাইয়েতকে বুঝানো হয়েছে, যারা তাদের ওয়ারিছগণকে শরী‘আত বিরোধী কাজকর্ম করতে নিষেধ করে যায়নি। এখানে ال এসেছে عهدى অর্থাৎ ‘নির্দিষ্টবাচক’ হিসাবে, استغراقى অর্থাৎ ‘সমষ্টিবাচক’ হিসাবে নয়। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি মৃত্যুর পূর্বে অছিয়ত করে গেছে, যেন তার মৃত্যুর পরে উচ্চৈঃস্বরে কান্নাকাটি করা না হয় এবং এযুগে যেসব বেশরা ও বিদ‘আতী রসম-রেওয়াজ পালন করা হয়, তা যেন করা না হয়, তার কবরে আযাব হবে না। কিন্তু যদি উক্ত মর্মে অছিয়ত না করে যায় (এবং পরিবারের লোকেরা বেশরা কাজ করে), তবে উক্ত ব্যক্তির কবরে আযাব হবে।

পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি অছিয়ত করে গেছে যেন তার মৃত্যুতে উচ্চৈঃস্বরে কান্নাকাটি-আহাজারী না করা হয় এবং শরী‘আত বিরোধী কোন অনুষ্ঠানাদি না করা হয়, যা এযুগে করা হয়ে থাকে, তাহ’লে উক্ত ব্যক্তির কবরে আযাব হবে

না। তবে যদি অছিয়ত না করে যায় বা উপদেশ না দিয়ে যায়, তাহ'লে আযাব হবে।

এ ব্যাখ্যা হ'ল ইমাম নববী ও অন্যান্য প্রসিদ্ধ বিদ্বানগণের ব্যাখ্যার অনুরূপ। এই ব্যাখ্যা জানার পর এখন আর অত্র হাদীছের সঙ্গে কুরআনের আয়াত وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَأُخْرَى 'একের পাপের বোঝা অন্যে বইবে না'-এর সাথে কোন বিরোধ রইল না। কেননা বিরোধ কেবল তখনই হবে, যখন হাদীছটির অর্থ সাধারণভাবে সকল মাইয়েতের জন্য প্রযোজ্য বলা হবে। অর্থাৎ প্রত্যেক মাইয়েতই আযাবপ্রাপ্ত হবে। কিন্তু যখন বিশেষ বিশেষ মাইয়েতের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে, অর্থাৎ শরী'আত বিরোধী কাজকর্ম থেকে স্বীয় পরিবার ও দলের লোকদের নিষেধ করে যাবে না, কেবল তাদেরই কবরে আযাব হবে- এমত ক্ষেত্রে অত্র হাদীছের সঙ্গে কুরআনের উপরোক্ত আয়াতের মধ্যে আর কোন বিরোধ থাকবে না। মোটকথা উচ্চৈঃস্বরে কান্নাকাটি ইত্যাদি বেশরা কাজে নিষেধ না করে যাওয়াটাই তার কবর আযাবের কারণ হবে।

দ্বিতীয় ব্যাখ্যা হ'ল যা শায়খুল ইসলাম ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) তাঁর কোন কোন গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, এখানে আযাবের অর্থ কবরের আযাব বা আখেরাতের আযাব নয়। বরং এর অর্থ হ'ল ব্যথাহত হওয়া, মর্মাহত হওয়া। অর্থাৎ মাইয়েত তার পরিবারের লোকদের উচ্চৈঃস্বরে কান্নাকাটি ও আহাজারিতে দুঃখিত ও বেদনাহত হন। শায়খুল ইসলামের এই ব্যাখ্যা সঠিক হ'লে কুরআনের আয়াতের সঙ্গে অত্র হাদীছের বিরোধের সামান্য সন্দেহটুকুরও মূলোৎপাটন হয়ে যায়।

কিন্তু আমি বলব যে, এই ব্যাখ্যা দু'টি বাস্তব বিষয়ের পরিপন্থী। যার কারণে প্রথম ব্যাখ্যাটি গ্রহণ করা ব্যতীত আমাদের আর কোন পথ থাকে না। প্রথম বিষয়টি হ'লঃ হযরত মুগীরাহ বিন শো'বা (রাঃ) বর্ণিত হাদীছটি, যা আমরা ইতিপূর্বে উদ্ধৃত করেছি। যা পরিষ্কারভাবে বলে দেয় যে, এই আযাবের অর্থ দুঃখবোধ নয়; বরং এর অর্থ জাহান্নামের আযাব। তবে যদি আল্লাহ তাকে মাফ করেন, সেকথা স্বতন্ত্র। কেননা তিনি বলেছেন- إِنَّ اللّٰهَ لاَ يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ 'নিশ্চয়ই আল্লাহ শিরকের গোনাহ মাফ

করেন না। এতদ্ব্যতীত সকল গোনাহ যাকে ইচ্ছা তিনি মাফ করে থাকেন' *(নিসা ৪/৪৮, ১১৬)*।

এক্ষণে হযরত মুগীরা বিন শো'বা (রাঃ)-এর রেওয়ায়াতে এসেছে, إِنَّ الْمَيِّتَ لَيُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ 'নিশ্চয়ই মাইয়েত তার পরিবারের কান্নাকাটির কারণে ক্বিয়ামতের দিন আযাবপ্রাপ্ত হবে'। এ হাদীছ স্পষ্ট বলে দিচ্ছে যে, ঐ ব্যক্তি তার পরিবারের কান্নাকাটির কারণে ক্বিয়ামতের দিন আযাব প্রাপ্ত হবে, কবরে নয়। যেটাকে ইবনু তায়মিয়াহ ব্যাখ্যা করেছেন 'দুঃখ ও বেদনা' রূপে।

দ্বিতীয় বিষয়টি হ'লঃ মৃত্যুর পরে মাইয়েত তার আশপাশে ভাল-মন্দ কি হচ্ছে কিছুই অনুভব করতে পারে না। যেমন এ বিষয়ে কুরআন ও সুন্নাহতে বর্ণিত হয়েছে। তবে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্র ব্যতীত, যেমন কোন কোন হাদীছে বলা হয়েছে। আল্লাহ ইচ্ছা করলে সকল মাইয়েতকে বা কোন কোন মাইয়েতকে কোন কোন বিষয় শুনিয়ে থাকেন, যা তাদের কষ্ট দেয়। যেমন প্রথমটির ব্যাপারে ছহীহ বুখারীতে হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) হ'তে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا وُضِعَ فِى قَبْرِهِ وَتَوَلَّى عَنْهُ أَصْحَابُهُ... حَتَّى إِنَّهُ سَمِعَ قَرْعَ نِعَالِهِمْ... أَتَاهُ مَلَكَانِ– 'যখন মাইয়েতকে কবরে রাখা হয় এবং তার লোকেরা চলে যায়- এমনকি তিনি তখনও তাদের জুতার আওয়ায শুনতে পান ... এমন সময় দু'জন ফেরেশতা এসে হাযির হন...'।[১২] অত্র ছহীহ হাদীছে বিশেষভাবে শ্রবণের প্রমাণ রয়েছে দাফনের সময় ও লোকদের চলে আসার সময়। অর্থাৎ যখন দু'জন ফেরেশতা এসে তাকে বসান, তখন তার দেহে রূহ ফিরিয়ে দেওয়া হয় এবং তখনই তিনি শুনতে পান। অতএব এই হাদীছ স্পষ্টভাবে এই অর্থ বুঝায় না যে, এই মাইয়েত বা সকল মাইয়েতের নিকটে রূহ ফেরত আসবে এবং তারা ক্বিয়ামত পর্যন্ত কবরের পাশ দিয়ে যাতায়াতকারীদের জুতার আওয়ায শুনতে পাবে। -না।

এটা হ'ল মাইয়েতের জন্য বিশেষ অবস্থা ও বিশেষ শ্রবণ। কেননা তখন রূহ তার মধ্যে ফিরিয়ে দেওয়া হয়। এ সময় যদি আমরা ইমাম ইবনে তায়মিয়াহ্‌র

১২. *বুখারী, মিশকাত হা/১২৬; ছহীহুল জামে' হা/১৬৭৫।*

ব্যাখ্যা গ্রহণ করি, তাহ'লে মাইয়েতের অনুভূতির গণ্ডীসীমা মাইয়েতের আশপাশে বিস্তৃত ধরে নিতে পারি। চাই তা দাফনের পূর্বে লাশের নিকটে হৌক বা লাশ কবরে রাখার পরে হৌক। অর্থাৎ মাইয়েত জীবিতদের কান্না শুনতে পায়। তবে এজন্য দলীল প্রয়োজন। কিন্তু তা নেই। এটাই হ'ল প্রথম কথা।

দ্বিতীয় কথা হ'লঃ কুরআন ও ছহীহ হাদীছের কোন কোন দলীল দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মৃতরা শুনতে পায় না। এটি একটি দীর্ঘ আলোচনা। কিন্তু আমি এখানে মাত্র একটি হাদীছ উল্লেখ করব এবং এর দ্বারা আমি আলোচ্য প্রশ্নের জওয়াব শেষ করব। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, إِنَّ لِلّٰهِ تَعَالَى مَلاَئِكَةً سَيَّاحِيْنَ فِى الْأَرْضِ يُبَلِّغُوْنِىْ عَنْ أُمَّتِى السَّلاَمَ– 'নিশ্চয়ই পৃথিবীতে আল্লাহ্‌র একদল ভ্রমণকারী ফেরেশতা রয়েছে, যারা আমার নিকটে আমার উম্মতের সালাম পৌঁছে দেয়'।[১৩] এখানে سَيَّاحِيْنَ অর্থ طَوَّافِيْنَ عَلَى الْمَجَالِسِ 'মজলিস সমূহে ভ্রমণকারী'। যখনই কোন মুসলমান রাসূলের উপরে দরূদ পাঠ করে, সেখানেই একজন ফেরেশতা মওজুদ থাকেন, যিনি তা সাথে সাথে রাসূলের নিকট পৌঁছে দেন। এক্ষণে যদি মৃতরা শুনতে পেতেন, তাহ'লে সবার আগে আমাদের নবী করীম (ছাঃ) তা শোনার অধিক হকদার ছিলেন। কেননা আল্লাহ তাকে বিশেষ মর্যাদা দান করেছেন এবং সকল নবী-রাসূল ও দুনিয়াবাসীর উপরে নানাবিধ বৈশিষ্ট্যে সমৃদ্ধ করেছেন। অতএব যদি কেউ শুনতে পেত, তাহ'লে রাসূল (ছাঃ) আগে শুনতে পেতেন। আর যদি নবী করীম (ছাঃ) তাঁর মৃত্যুর পরে কিছু শুনতে পেতেন, তাহ'লে তিনি অবশ্যই স্বীয় উম্মতের দরূদ শুনতে পেতেন।

এখান থেকেই আপনারা ঐসব লোকের ভুল বরং পথভ্রষ্টতা বুঝতে পারবেন, যারা রাসূলের নিকটে নয়, বরং তাঁর চাইতে নিম্নস্তরের মানুষের কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে থাকে- চাই সেই ব্যক্তি রাসূল হৌন, নবী হৌন বা কোন নেক বান্দা হৌন। কেননা তারা যদি রাসূলের নিকটে ফরিয়াদ পেশ করে, তাহ'লে তিনি তা অবশ্যই শুনতে পান না। যেমন পবিত্র কুরআনে স্পষ্ট বর্ণিত হয়েছে,

১৩. *ছহীহুল জামে' হা/২১৭৪; নাসাঈ, দারেমী, মিশকাত হা/৯২৪ 'ছালাত' অধ্যায়, 'নবীর উপর দরূদ' অনুচ্ছেদ।*

إِنَّ الَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللهِ عِبَادٌ أَمْثَالُكُمْ– 'আল্লাহ ব্যতীত অন্য যাদেরকে তোমরা ডাকো, ওরা তোমাদেরই মত বান্দা' *(আ'রাফ ৭/১৯৪)*। وَإِنْ تَدْعُوْهُمْ لاَيَسْمَعُوْا دُعَائَكُمْ 'আর যদি তোমরা ওদের ডাকো, ওরা তোমাদের ডাক শুনতে পাবে না' *(ফাত্বির ৩৫/১৪)*।

এক্ষণে মোদ্দা কথা হ'ল, মৃত্যুর পরে কোন মাইয়েত শুনতে পায় না। কেবল বিশেষ ক্ষেত্রে যেখানে বিশেষ দলীল এসেছে। যেমন ইতিপূর্বে আমরা উল্লেখ করেছি মাইয়েতের লোকদের জুতার আওয়ায শোনা বিষয়ে। এখানেই আলোচ্য প্রশ্নের জওয়াব শেষ হ'ল।

প্রশ্ন-৪ : যখন পবিত্র কুরআনের ক্যাসেট চালু থাকে, তখন যদি সেখানে উপস্থিত কোন লোক অন্য কথায় মশগুল থাকার কারণে কুরআন শোনার প্রতি মনোযোগ না দেয়, তাহ'লে এই না শোনার হুকুম কি? যিনি শুনছেন না তিনি গোনাহগার হবেন, না যিনি ক্যাসেট চালু রেখেছেন তিনি দায়ী হবেন?

উত্তর : মজলিসের ভিন্নতার কারণে অত্র বিষয়টির জওয়াব ভিন্নরূপ হবে। যদি মজলিসটি ইলম, যিকর ও তেলাওয়াতে কুরআনের হয়, তাহ'লে এই মজলিসে উপস্থিত সকলকে সেদিকে পূর্ণ মনোযোগ দেওয়া ওয়াজিব হবে। যদি কেউ না দেয়, তাহ'লে সে গোনাহগার হবে আল্লাহ্‌র এই নির্দেশের বিরোধিতার কারণে- وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوْا لَهُ وَأَنْصِتُوْا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ- 'যখন কুরআন পাঠ করা হয়, তখন তোমরা তা মনোযোগ দিয়ে শোনো এবং চুপ থাকো, সম্ভবতঃ তোমরা রহমত প্রাপ্ত হবে' *(আ'রাফ ৭/২০৪)*। পক্ষান্তরে যদি মজলিসটি ইলম, যিকর ও তেলাওয়াতের না হয়, বরং সাধারণ মজলিস হয়, যেমন মানুষ বাড়ীতে কাজ করে বা পড়ায় বা নিজে পড়াশুনা করে, এমতাবস্থায় ক্যাসেট চালু করা বা উচ্চকণ্ঠে তেলাওয়াত করা জায়েয নয়। যা বাড়ীতে বা কোন বৈঠকে অবস্থানরত ব্যক্তির কানে পৌঁছে যায়। ঐ ব্যক্তিগণ এসময় কুরআন শুনতে বাধ্য নয়। কেননা তারা এজন্য বসেনি। অতএব তখন দায়ী হবে যে ব্যক্তি উঁচু স্বরে ক্যাসেট চালু করেছে এবং অন্যকে তার আওয়ায শুনাচ্ছে। কেননা এর দ্বারা সে লোকদের উপরে সংকীর্ণতা আরোপ করেছে এবং তাদেরকে কুরআন শুনতে বাধ্য করেছে এমন অবস্থায় যে তারা তখন এজন্য প্রস্তুত নয়।

এর বাস্তব উদাহরণ হ'ল, আমাদের মধ্যে যখন কেউ রাস্তায় চলেন, তখন তিনি ঘি বিক্রেতা, মরিচ বিক্রেতা বা কুরআনের ক্যাসেট বিক্রেতাদের নিকট থেকে উচ্চৈঃস্বরে কুরআনের ক্যাসেটের আওয়ায শুনতে পাবেন, যা রাস্তা মাতিয়ে রাখে। যেখানেই আপনি যাবেন, এ আওয়ায শুনবেন। এমতাবস্থায় রাস্তার পথচারীগণ কি কুরআনের প্রতি মনোযোগ না দেওয়ার জন্য দায়ী হবেন? যা যথাস্থানে পাঠ করা হচ্ছে না। - না। বরং দায়ী হবে ঐ ব্যক্তি যে লোকদের উপরে সংকীর্ণতা আরোপ করছে এবং তাদের কুরআন শুনাচ্ছে- ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে বা লোকদের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য বা অনুরূপ কোন বৈষয়িক স্বার্থের জন্য। এ সময় ঐ লোকেরা কুরআনকে বাদ্য-বাজনার নিরিখে গ্রহণ করে থাকে। যেমন কোন কোন হাদীছে এ বিষয়ে বর্ণিত হয়েছে।[১৪] অতঃপর ঐ লোকেরা ইহুদী-নাছারাদের থেকে ভিন্ন ধারায় আল্লাহ্‌র আয়াত সমূহ বিক্রি করে সামান্য অর্থ উপার্জন করে মাত্র। যাদের সম্পর্কে আল্লাহ বলেছেন, وَاشْتَرَوْا بِآيَاتِ اللّٰهِ ثَمَنًا قَلِيْلاً 'তারা আল্লাহ্‌র আয়াত সমূহ স্বল্প মূল্যে বিক্রয় করে' *(তওবা ৯/৯)*।

প্রশ্ন-৫ : আল্লাহ পাক নিজের সম্পর্কে বলেছেন, وَمَكَرُوْا وَمَكَرَ اللّٰهُ وَاللّٰهُ خَيْرُ الْمَاكِرِيْنَ- 'তারা কৌশল করে, আল্লাহও কৌশল করেন। বস্তুতঃ আল্লাহ শ্রেষ্ঠ কৌশলকারী'- এ আয়াতের প্রকাশ্য বক্তব্য দেখে অনেকে এর মূল অর্থ বুঝতে সক্ষম হয় না। আর আমরা যেহেতু কোনরূপ তাবীলের প্রয়োজন বোধ করি না। অতএব কিভাবে আল্লাহ خَيْرُ الْمَاكِرِيْنَ হ'লেন?

উত্তর : আল্লাহ্‌র রহমতে বিষয়টি সহজ। নিশ্চয়ই আমরা এ বিষয়টি বুঝতে সক্ষম যে, 'মকর' সর্বাবস্থায় 'মন্দ' নয়। যেমন সেটা সর্বাবস্থায় 'ভাল' নয়। অনেক কাফের আছে, যে মুসলমানকে ধোঁকা দেয়। কিন্তু মুসলিম ব্যক্তি দূরদর্শী ও হুঁশিয়ার। সে আত্মভোলা ও বোকা নয়। সে তার প্রতিপক্ষ কাফেরের প্রতারণার বিষয়ে সতর্ক। ফলে সে তার প্রতারণার বিপরীতে ব্যবস্থা গ্রহণ করে। ফল দাঁড়ায় এই যে, মুসলিম ব্যক্তি তার উত্তম কৌশলের সাহায্যে কাফের ব্যক্তির মন্দ কৌশলের প্রতিরোধ করে। সে অবস্থায় কি বলা যাবে যে,

১৪. (يَتَّخِذُوْنَ الْقُرْآنَ مَزَامِيْرًا) *আহমাদ, ৩/৪৯৪; সিলসিলা ছহীহাহ হা/৯৭৯।*

মুসলিম ব্যক্তির কাফেরের মুকাবিলায় কৌশল গ্রহণ করাটা অন্যায় কাজ হয়েছে? কেউ সেকথা বলবে না।

সহজে আপনারা এ বিষয়টি বুঝতে চেষ্টা করুন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর বক্তব্য থেকে। তিনি বলেছেন اَلْحَرْبُ خُدْعَةٌ 'যুদ্ধ হ'ল ধোঁকা'।[১৫] এখানে ধোঁকা সম্পর্কে যে বক্তব্য 'মকর' বা কৌশল সম্পর্কেও পুরাপুরি একই বক্তব্য। নিঃসন্দেহে মুসলমানের জন্য অন্য মুসলমানকে ধোঁকা দেওয়া হারাম। কিন্তু যে কাফের আল্লাহ ও রাসূলের শত্রু, তাকে ধোঁকা দেওয়া হারাম নয়, বরং ওয়াজিব। অনুরূপভাবে কাফেরের বিরুদ্ধে মুসলমানের কৌশল করা, যে কাফের তার বিরুদ্ধে কৌশল করার পায়তারা করে- তার কৌশল ব্যর্থ করে দেওয়ার জন্য মুসলমানের কৌশল অবলম্বন করাটা উত্তম। কেননা ইনি মানুষ, উনিও মানুষ। এক্ষণে এটা যদি সর্বশক্তিমান ও সর্বজ্ঞ আল্লাহ্‌র দিকে সম্পর্কিত হয়, তখন আমরা কি বলব? যিনি কৌশলকারীদের সকল কৌশল ব্যর্থ করে দিতে পারেন। আর একারণেই বলা হয়েছে وَاللّٰهُ خَيْرُ الْمَاكِرِيْنَ 'আল্লাহ শ্রেষ্ঠ কৌশলকারী' *(আলে ইমরান ৩/৫৪)*। আল্লাহ যখন নিজের জন্য এই বিশেষণ গ্রহণ করেছেন, তখন বুঝা যায় যে, কৌশল করাটা এমনকি মানুষের জন্যেও সব সময় নিন্দনীয় নয়। কেননা আল্লাহ خَيْرُ الْمَاكِرِيْنَ 'শ্রেষ্ঠ কৌশলকারী'। অতএব সংক্ষেপে আমি বলব, আপনার অন্তরে যেসব কথার উদয় হয়, আল্লাহ তার বিপরীত। যখন মানুষ কোন কল্পনা করে যা আল্লাহ্‌র উপযুক্ত নয়, তখন তার জানা উচিত যে, সে পুরোপুরিই ভ্রান্ত। এক্ষণে আলোচ্য আয়াতটি আল্লাহ্‌র জন্য 'প্রশংসা'। এর মধ্যে এমন কিছু নেই যা আল্লাহ্‌র দিকে সম্পর্কিত করা সিদ্ধ নয়।

প্রশ্ন-৬ : নিম্নের দু'টি আয়াতের মধ্যে আমরা কিভাবে সামঞ্জস্য বিধান করতে পারি? যেমন আল্লাহ বলেন, وَمَن يَّبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلاَمِ دِيناً فَلَن يُّقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ- 'যে ব্যক্তি ইসলাম ব্যতীত অন্য দ্বীন তালাশ করে, কখনোই তা কবুল করা হবে না'... ***(আলে ইমরান ৩/৮৫)*****। এবং অন্যত্র আল্লাহ বলেন, إِنَّ الَّذِيْنَ آمَنُواْ وَالَّذِيْنَ هَادُواْ وَالصَّابِؤُوْنَ وَالنَّصَارَى مَنْ آمَنَ**

১৫. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৩৯৩৯* 'জিহাদ' অধ্যায় ৪ অনুচ্ছেদ।

بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وعَمِلَ صَالِحاً فَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُوْنَ– **'নিশ্চয়ই মুসলমান, ইহুদী, ছাবেঈ ও নাছারাদের মধ্যে যারা আল্লাহ ও শেষ দিবসের উপরে বিশ্বাস স্থাপন করেছে এবং সৎকর্ম করেছে, তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা চিন্তান্বিত হবে না'** ***(মায়েদাহ ৫/৬৯)*।**

উত্তর : দু'টি আয়াতের মধ্যে কোন বিরোধ নেই, যা ধারণা করা হয়েছে। প্রথম আয়াতটি হ'ল ইসলাম আসার পরের অবস্থা সম্পর্কে। আর দ্বিতীয় আয়াতে যাদের কথা বলা হয়েছে, তাদের কাছে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছে যাওয়ার পরে যদি তারা ঈমান আনে, আখেরাতে বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎকর্ম সম্পাদন করে তাহ'লে لاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُوْنَ 'তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা চিন্তান্বিত হবে না'।

আয়াতে ছাবেঈ (الصابئين)-দের কথা বলা হয়েছে। ছাবেঈ বলতেই 'তারকা পূজারী'দের (عُبَّاد الكواكب) কথা মাথায় চলে আসে। আসলে ছাবেঈ বলতে ঐসব লোকদের বুঝায়, যারা প্রথমে তাওহীদপন্থী ছিল। কিন্তু পরে তারকাপূজাসহ নানাবিধ শিরকের মধ্যে পতিত হয়েছে। এক্ষণে আয়াতে বর্ণিত ছাবেঈগণ বলতে ইসলাম আসার পূর্বেকার ঈমানদার তাওহীদপন্থী লোকদের বুঝানো হয়েছে। যেমন ইহুদী, নাছারা প্রভৃতি। যেখানে ছাবেঈ কথাটি এসেছে তার পূর্বাপর আলোচনাতেও সেটা বুঝা যায়। অতএব এঁরা হ'লেন সেই সকল মানুষ, যারা স্ব স্ব যুগের দ্বীনের উপরে নিষ্ঠাবান ছিলেন। তারা হ'লেন ঐ সকল মুমিন لاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ 'যাদের কোন ভয় নেই এবং যারা চিন্তান্বিত হবে না'। কিন্তু আল্লাহ পাক মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে দ্বীন ইসলাম সহ প্রেরণের পরে এবং ইসলামের দাওয়াত ঐসব ইহুদী, নাছারা ও ছাবেঈদের কাছে পৌঁছে যাওয়ার পরে তাদের থেকে ইসলাম ব্যতীত অন্য কিছুকেই আর কবুল করা হবে না।

এক্ষণে আল্লাহ্র বাণী, وَمَن يَّبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلاَمِ دِيْناً অর্থ আল্লাহ্র রাসূলের যবানীতে ইসলাম আসার পরে এবং ঐ ব্যক্তির নিকটে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছে গেলে তার কাছ থেকে আর কিছুই কবুল করা হবে না ইসলাম ব্যতীত।

অতঃপর ঐ সমস্ত লোক যারা রাসূলের ইসলাম নিয়ে আগমনের পূর্বে ছিল, অথবা যাদেরকে আজকাল ভূপৃষ্ঠে দেখা যায় যে, তাদের কাছে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছেনি, অথবা ইসলামের দাওয়াত পৌঁছেছে, কিন্তু তার ভিত্তি ও মূল বিষয়কে পরিবর্তন করে পৌঁছানো হয়েছে। যেমন বিভিন্ন প্রসঙ্গে আমি উদাহরণ স্বরূপ কাদিয়ানীদের কথা বলি, যারা আজকাল ইউরোপ-আমেরিকায় ইসলামের দাওয়াত দিচ্ছে। কিন্তু যে ইসলামের দিকে তারা দাওয়াত দিচ্ছে, তাতে ইসলামের কিছু নেই। কেননা তারা বলে থাকে যে, শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর পরেও নবীগণ আসবেন। ফলে ঐসব ইউরোপ-আমেরিকানদের কাছে কাদিয়ানী ইসলামের দাওয়াত পৌঁছানো হচ্ছে। কিন্তু প্রকৃত ইসলামের দাওয়াত তাদের কাছে পৌঁছাচ্ছে না।

এক্ষণে উপরের বক্তব্যগুলি দুই প্রকারের। এক প্রকারের ঐসব লোক যারা তাদের পূর্বধর্মে নিষ্ঠাবান ছিল, তাদের জন্য প্রযোজ্য হবে إِنَّ الَّذِيْنَ آمَنُوْا وَالَّذِيْنَ هَادُوْا আয়াতটি *(মায়েদাহ ৫/৬৯)*।

দ্বিতীয় প্রকারের লোক তারাই যারা এই দ্বীন ইসলাম থেকে দূরে সরে গেছে, যেমন আজকাল বহু মুসলমানের মধ্যে দেখা যায়, তাদের বিরুদ্ধে দলীল প্রতিষ্ঠিত হবে (অর্থাৎ তাদের থেকে কোন কিছুই কবুল করা হবে না)। অতঃপর যাদের নিকট ইসলামের দাওয়াত আদৌ পৌঁছেনি, চাই তা ইসলাম আগমনের পরে হৌক বা পূর্বে হৌক, তাদের জন্য আখেরাতে আল্লাহ্র বিশেষ ব্যবস্থাপনা থাকবে। আর সেটা এই যে, তাদের পরীক্ষার জন্য আল্লাহ তাদের কাছে একজন রাসূলকে পাঠাবেন। যেমন দুনিয়াতে তাদের পরীক্ষার জন্য রাসূল পাঠানো হয়েছিল। অতঃপর যে ব্যক্তি ক্বিয়ামতের দিনের ভয়ংকরতার মধ্যে রাসূলের দাওয়াতে সাড়া দিবে ও তার আনুগত্য করবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর যে ব্যক্তি অবাধ্যতা করবে, সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে।[১৬]

প্রশ্ন-৭ : আল্লাহ বলেন, وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوْبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَّفْقَهُوْهُ وَفِيْ آذَانِهِمْ وَقْراً 'আমরা তাদের অন্তরের উপর আবরণ টেনে দিয়েছি যাতে ওরা কুরআন

১৬. *আবু ইয়া'লা, বায্যার, সিলসিলা ছহীহাহ হা/২৪৬৮*।

বুঝতে না পারে এবং ওদের কানে বধিরতা এঁটে দিয়েছি’... *(আন‘আম ৬/২৫; কাহ্ফ ১৮/৫৭)*। **অনেকে এ আয়াতের মধ্যে জাবরিয়া মতবাদের গন্ধ পান। এ বিষয়ে আপনার বক্তব্য কি?**

উত্তর : এখানে ‘আমরা তাদের অন্তরের উপর আবরণ টেনে দিয়েছি’ অর্থ তাদের অন্তরে লুকানো কুফরী ও অবাধ্যতার ‘প্রাকৃতিক আবরণ টেনে দিয়েছি’ (جعل كوني)। এটা বুঝার জন্য ‘আল্লাহ্র ইচ্ছা’ (الإرادة الإلهية) কথাটির তাৎপর্য ভালভাবে অনুধাবন করা আবশ্যক। ‘আল্লাহ্র ইচ্ছা’ দু’প্রকারের: ‘বিধানগত ইচ্ছা’ (إرادة شرعية) ও ‘প্রাকৃতিক ইচ্ছা’ (إرادة كونية)। ‘বিধানগত ইচ্ছা’ হ’ল, যা আল্লাহ তাঁর বান্দাদের উপরে বিধিবদ্ধ করেছেন এবং তাদেরকে ফারায়েয-ওয়াজিবাত, সুন্নাত-নফল প্রভৃতি বিধান সমূহ বাস্তবায়নে উৎসাহিত করেছেন। অতঃপর ‘প্রাকৃতিক ইচ্ছা’ হ’ল, কখনো কখনো ঐ সকল বিষয়ে যা আল্লাহ বিধিবদ্ধ করেননি, কিন্তু তিনি তা নির্ধারণ করেছেন। এইসব ইচ্ছাকে ‘প্রাকৃতিক ইচ্ছা’ (إرادة كونية) বলা হয়। যেমন আল্লাহ বলেন, إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئاً أَنْ يَّقُوْلَ لَهُ كُنْ فَيَكُوْنُ ‘তিনি যখন কোন কিছু করতে ইচ্ছা করেন, তখন তাকে কেবল বলেন, ‘হও’ ব্যস হয়ে যায়’ *(ইয়াসীন ৩৬/৮২)*। এখানে কোন কিছু (شيئاً) অনির্দিষ্ট বাচক বিশেষ্য, যা ভাল-মন্দ সব ধরনের কাজকে শামিল করে। আর এটা হয়ে থাকে কেবল ‘কুন’ আদেশসূচক শব্দ দ্বারা। অর্থাৎ তাঁর ইচ্ছায়, তাঁর সিদ্ধান্তে, তাঁর নির্ধারণে। এটা বুঝার পরে আমরা ফিরে যাব ‘ক্বাযা ও ক্বদরের’ বিষয়টির দিকে। আল্লাহ যখনই কোন কাজের জন্য ‘কুন’ বলেন, তখনই সেই কাজটি পূর্বনির্ধারিত হিসাবে গণ্য হয়। আর আল্লাহ্র নিকটে সকল বস্তুই পূর্বনির্ধারিত। যা ভাল ও মন্দ সব বিষয়কে শামিল করে।

এক্ষণে জিন ও ইনসান যারা আল্লাহ্র বিধান সমূহ মানতে বাধ্য ও আদিষ্ট- আমরা দেখব যে, আমাদের সম্পর্কিত বিষয়গুলি কি স্রেফ আমাদের ইচ্ছা ও এখতিয়ারে হয়ে থাকে, নাকি আমাদের ইচ্ছার বাইরেও হয়ে থাকে? দ্বিতীয় বিষয়টির সাথে আনুগত্য বা অবাধ্যতার কোন সম্পর্ক নেই এবং এর পরিণাম ফল হিসাবে জান্নাত বা জাহান্নামের কোন সম্পর্ক নেই। কিন্তু প্রথমটির বিষয়ে যেখানে শরী‘আতের বিধান সমূহ রয়েছে, তার প্রতি আনুগত্য বা অবাধ্যতার

ফলাফল হিসাবে জান্নাত বা জাহান্নাম নির্ধারিত আছে। অর্থাৎ মানুষ যেটা ইচ্ছাকৃতভাবে করে এবং তার জন্য স্বেচ্ছায় চেষ্টা-তদবির করে, সে কাজটির হিসাব নেওয়া হবে। ভাল কাজ হ’লে ভাল ফল পাবে, মন্দ কাজ হ’লে মন্দ ফল পাবে। আর মানুষ তার কর্মসমূহের সিংহভাগ নিজ ইচ্ছায় করে থাকে। এটিই হ’ল বাস্তব কথা। যার মধ্যে শরী‘আত ও যুক্তি কোন দিক দিয়েই ঝগড়ার কোন অবকাশ নেই। শরী‘আতের দিক দিয়ে ঝগড়ার অবকাশ নেই একারণে যে, কুরআন ও সুন্নাহে অবিরত ধারায় ঐসব দলীল মওজুদ রয়েছে যে, মানুষ কেবল ঐসমস্ত কাজ করবে, যা তাকে হুকুম করা হয়েছে এবং ঐসকল কাজ ছাড়বে, যা তাকে নিষেধ করা হয়েছে। এইসব দলীল এত বেশী যে তা বর্ণনার অতীত।

অতঃপর যুক্তির দিক দিয়ে ঝগড়ার কোন অবকাশ নেই একারণে যে, একথা অত্যন্ত পরিষ্কার যে, মানুষ যখনই কোন কথা বলে, চলাফেরা করে, খায় বা পান করে কিংবা যখনই কোন কাজ করে যা তার এখতিয়ারাধীন, তখন সে কাজে সে স্বাধীন ইচ্ছার মালিক এবং মোটেই বাধ্য নয়। আমি যদি ইচ্ছা করি যে, এখন আমি কথা বলব, তাহ’লে কেউ নেই যে আমাকে এই স্বাভাবিক অবস্থায় বাধ্য করে। কিন্তু এটি তাক্বদীরে পূর্বনির্ধারিত। অর্থাৎ পূর্বনির্ধারিত হওয়ার সাথে সাথে এটি আমারই কথা। আরও সরলার্থ হ’ল, আমি যা বলব এবং যেসব কথা বলব তার এখতিয়ার সহ এটি পূর্ব নির্ধারিত। কিন্তু ঐ ক্ষমতা সহকারে যে আমি চুপ থাকব ঐ ব্যক্তির জন্য যে ব্যক্তি আমার কথায় সন্দেহ পোষণ করে। আমি এ ব্যাপারে স্বাধীন।

এক্ষণে মানুষের স্বাধীন ইচ্ছাশক্তির বিষয়টি বাস্তবে এমন যে, এতে কোন ঝগড়া-বিসম্বাদের সুযোগ নেই। যে ব্যক্তি এতে বিতণ্ডা করে, সে ব্যক্তি একটি স্পষ্ট বিষয়ে সন্দেহ আরোপ করে মাত্র। মানুষ যখন এই স্তরে পৌঁছে যায়, তখন তার সাথে কথা বন্ধ হয়ে যায়। মানুষের কাজকর্ম দু’ধরনের হয়ে থাকে। স্বেচ্ছাকৃত ও বাধ্যগত। বাধ্যগত বিষয়ে আমাদের কোন কথা নেই। না শরী‘আতের দিক দিয়ে, না বাস্তবতার দিক দিয়ে। শরী‘আত হ’ল স্বেচ্ছাকৃত কর্মসমূহের সাথে সম্পৃক্ত। আর এটাই হ’ল মূল কথা। এই বিষয়গুলো মাথায় রাখার পর এবার আমরা বুঝতে সক্ষম হবো পূর্বের আয়াতটি وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوْبِهِمْ أَكِنَّةً ‘আর আমরা তাদের অন্তরের উপরে আবরণ টেনে দিয়েছি’

(আন'আম ৬/২৫)। এখানে 'আবরণ টেনে দেওয়ার' অর্থটি 'প্রকৃতিগত' (جعل كوني)। অনুরূপ আরেকটি আয়াত আমরা মনে করিয়ে দিই, যা ইতিপূর্বে বলা হয়েছে إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئاً 'তিনি যখন কোন কিছু করতে ইচ্ছা করেন' *(ইয়াসীন ৩৬/৮২)*। এখানে 'ইচ্ছা করা' বিষয়টিও প্রকৃতিগত (الإرادة الكونية)। কিন্তু 'আল্লাহ্‌র ইচ্ছা' কথাটি এবং 'তাদের অন্তরে আবরণ টেনে দেওয়া' কথাটি এক নয়।

বস্তুগত দিক দিয়ে এর উদাহরণ হ'ল, যেমন মানুষ যখন ভূমিষ্ট হয়, তখন তার দেহের মাংস থাকে নরম তুলতুলে। তারপর সে যত বড় হ'তে থাকে, তার গোশত ও হাড্ডি তত শক্ত হ'তে থাকে। কিন্তু সকল মানুষ এব্যাপারে সমান নয়। অনুরূপভাবে মানুষ লেখাপড়া করে, তাতে তার জ্ঞান পুষ্ট হয় ও মস্তিষ্ক শক্তিশালী হয় যে বিষয়ে সে গবেষণায় লিপ্ত থাকে এবং তার পূর্ণ প্রচেষ্টা নিয়োজিত করে। কিন্তু শারীরিক দিক দিয়ে দেখা যায় যে, তার দেহ আর শক্তিশালী হয় না বা তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সমূহ আর বৃদ্ধি পায় না।

এর সম্পূর্ণ বিপরীত দিক হ'ল একজন ব্যক্তি তার দৈহিক সামর্থ্য বাড়ানোর জন্য সারাদিন অনুশীলনে ব্যস্ত থাকে, যেমন তারা আজকাল বলে থাকে। এতে তার পেশীসমূহ শক্ত হয় এবং দেহ শক্তিশালী হয়। এইসব বাহাদুরদের ছবি আমরা মাঝে-মধ্যে দেখি। অথচ ঐ ব্যক্তি কি ঐভাবে জন্মগ্রহণ করেছিল? নাকি তার নিয়মিত অনুশীলনের মাধ্যমে ঐরূপ স্বাস্থ্য গঠিত হয়েছে? নিঃসন্দেহে এটি হয়েছে তার চেষ্টায় ও তার ইচ্ছায়।

এটিই হ'ল ঐ ব্যক্তির উদাহরণ, যে ব্যক্তি পথভ্রষ্টতা, অবাধ্যতা, কুফরী ও নাস্তিকতার মধ্যে লালিত-পালিত হয়েছে। যা পরে মরিচা ধরার পর্যায়ে এবং আবরণ টেনে দেয়ার পর্যায়ে পৌঁছে গেছে, যা আল্লাহ তার অন্তরে করে দিয়েছেন। এটা আল্লাহ তার উপরে ফরয করেননি বা তাকে বাধ্য করেননি। এটা হয়েছে তার নিজস্ব অর্জন ও স্বেচ্ছাকৃত কর্মের ফলে। আর এটাই হ'ল প্রাকৃতিক ক্রিয়া (الجعل الكوني) যা ঐ কাফের লোকেরা উপার্জন করেছে। অতঃপর তা ঐ কালিমা চিহ্নে পৌঁছে গেছে, যাকে মূর্খরা ভেবেছে যে, এটাই তাদের উপরে ফরয করা হয়েছে। অথচ এটি তাদের কর্মের ফল। বস্তুতঃ আল্লাহ তাঁর বান্দাদের উপরে যুলুমকারী নন।

প্রশ্ন-৮ : কুরআনে চুম্বন দেওয়ার হুকুম কি?

উত্তর : আমাদের মতে বিষয়টি সাধারণ হাদীছ সমূহের হুকুমের অন্তর্ভুক্ত। যেমন إِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُوْرِ فَانَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ 'তোমরা দ্বীনের মধ্যে নবোদ্ভূত বিষয় সমূহ হ'তে দূরে থাক। কেননা প্রত্যেক নবোদ্ভূত বস্তুই বিদ'আত এবং প্রত্যেক বিদ'আতই ভ্রষ্টতা'। অন্য হাদীছে এসেছে, وَكُلُّ ضَلاَلَةٍ فِى النَّارِ 'এবং প্রত্যেক ভ্রষ্টতার পরিণাম জাহান্নাম'।

এইসব বিষয়ে কিছু লোকের বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে। তারা বলেন, এতে আর এমন কি? এটা তো কুরআন মজীদকে সম্মান করা ভিন্ন অন্য কিছু নয়? কিন্তু প্রশ্ন হ'ল, এমন সম্মান ও মর্যাদা প্রদর্শনের বিষয়টি কি প্রথম যুগের মুসলমানদের নিকটে গোপন ছিল? অর্থাৎ ছাহাবায়ে কেরাম ও তাঁদের শিষ্য তাবেঈনে এযাম ও তাঁদের শিষ্য তাবে-তাবেঈনের নিকটে? নিঃসন্দেহে এর জওয়াব হবে সেটাই যা পূর্ববর্তী বিদ্বানগণ বলেন, لوكان خيرًا لسبقونا إليه 'যদি এটা উত্তম হ'ত, তাহ'লে অবশ্যই তাঁরা আমাদের আগেই একাজ করতেন'।

এটা হ'ল একটি দিক। আরেকটি দিক হ'ল, কোন বস্তুকে চুম্বন দেওয়ার মূলে কি নিহিত রয়েছে? সিদ্ধতা না নিষিদ্ধতা? এখানে পাঠককে স্মরণ করিয়ে দেওয়ার জন্য ছহীহায়নে বর্ণিত সেই প্রসিদ্ধ হাদীছটি আমরা অবশ্যই পেশ করব, যাতে বর্তমান যুগের মুসলমানরা তাদের পূর্ববর্তীদের বুঝ থেকে কত দূরে অবস্থান করছে, তা উপলব্ধি করতে পারে এবং তারা ঐসব বিষয়ে সমাধানে আসতে পারে, যেসব বিষয় তাদের কাছে আলোচনা করা হয়।

হাদীছটি হ'ল, আবেস বিন রাবী'আহ হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ)-কে হাজারে আসওয়াদ চুম্বন করতে দেখলাম যে এ সময় তিনি বলছেন,

إِنِّيْ لَأَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ لاَ تَضُرُّ وَلاَ تَنْفَعُ، فَلَوْلاَ أَنِّيْ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُقَبِّلُكَ مَا قَبَّلْتُكَ ، متفق عليه–

'আমি অবশ্যই জানি যে তুমি একটা পাথর। না ক্ষতি করতে পার, না উপকার করতে পার। আমি যদি না দেখতাম যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তোমাকে চুম্বন

দিচ্ছেন, তাহ'লে আমি তোমাকে চুম্বন দিতাম না'।[১৭] এক্ষণে ওমর (রাঃ) হাজারে আসওয়াদ কেন চুম্বন দিলেন? কেননা ছহীহ হাদীছে এসেছে, اَلْحَجَرُ الأَسْوَدُ مِنَ الْجَنَّةِ 'হাজারে আসওয়াদ জান্নাতের পাথর'।[১৮] এখানে ওমর (রাঃ) কি এই যুক্তির ভিত্তিতে চুম্বন দিয়েছেন যে, এটি জান্নাতের একটি নিদর্শন, মুমিনদেরকে যার ওয়াদা করা হয়েছে; অতএব আমি একে চুম্বন করব? এজন্য চুম্বন বিষয়ে রাসূলের নির্দেশনা আমার নিকটে স্পষ্ট হওয়ার কোন প্রয়োজন নেই। যেমন প্রশ্নকারী তার আলোচ্য প্রশ্নে বলেছেন যে, এটি আল্লাহ্‌র কালাম। অতএব আমরা একে চুম্বন করব। নাকি এসব প্রশাখাগত বিষয়ে আমরা ঐরূপ আচরণ করব, যেরূপ কিছু লোক আজকাল নামকরণ করেছেন 'সালাফী তর্কশাস্ত্র' (المنطق السلفي) বলে, যার বক্তব্য হ'ল, খালেছভাবে আল্লাহ্‌র রাসূলের পদাংক অনুসরণ করা এবং ক্বিয়ামত পর্যন্ত তাঁর সুন্নাতের পায়রবী করা'। আর এটাই ছিল ওমর (রাঃ)-এর দৃষ্টিভঙ্গি'। যেজন্য তিনি বলেছিলেন, 'যদি আমি না দেখতাম যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তোমাকে চুম্বন দিচ্ছেন, তাহ'লে আমি তোমাকে চুম্বন দিতাম না'।

অতএব এই ধরনের চুম্বনের বিষয়ে মূলনীতি হ'ল এই যে, আমরা বিগত সুন্নাতের উপরে চলব। এসব বিষয়ে আমরা এমন হুকুম দেব না যে, هذا حسن وماذا في ذلك 'এটা ভাল কাজ। এতে এমন আর কি আছে'?

এ বিষয়ে যায়েদ বিন ছাবিত (রাঃ)-এর পদক্ষেপ দেখুন। যখন কুরআনকে হেফাযতের উদ্দেশ্যে আবুবকর ও ওমর (রাঃ) তাকে সংকলনের প্রস্তাব দেন, তখন তিনি বলে ওঠেন, كَيْفَ تَفْعَلُوْنَ شَيْئًا مَا فَعَلَهُ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ 'আপনারা কিভাবে এরূপ কাজ করবেন, যা আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ) করেননি?' আজকাল মুসলমানদের নিকটে দ্বীনের বিষয়ে এরূপ বুঝ আদৌ নেই।

১৭. *ছহীহ তারগীব ১/৯৪/৪১; মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/২৫৮৯* 'মানাসিক' অধ্যায় 'মক্কায় প্রবেশ ও ত্বাওয়াফ' অনুচ্ছেদ।

১৮. *ছহীহুল জামে' হা/৩১৭৪; আহমাদ, তিরমিযী, মিশকাত হা/২৫৭৭।*

কুরআনে চুম্বনকারী ব্যক্তিকে যখন বলা হয়, কিভাবে তুমি একাজ করছ, যা আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ) করেননি, তখন সে আপনার মুখের উপরে কয়েকটি বিস্ময়কর জওয়াব দিবে। যেমন (১) আরে ভাই! এতে কি এমন এসে যায়? এর মধ্যে তো কুরআনের তা'যীম রয়েছে। তখন আপনি তাকে বলুন, হে ভাই! একথা আপনার বিরুদ্ধে ফিরে যাবে। আচ্ছা, আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ) কি কুরআনের তা'যীম করতেন না? নিঃসন্দেহে তিনি কুরআনের তা'যীম করতেন। এতদসত্ত্বেও তিনি তাতে চুমু দিতেন না।

(২) অথবা বলবে, আপনি আমাদেরকে কুরআনে চুমু দিতে নিষেধ করছেন। অথচ আপনি বাস-ট্যাক্সি, বিমান ইত্যাদিতে চড়ে ভ্রমণ করেন। আর এগুলি সবই নবাবিস্কৃত বা বিদ'আত।

এর জবাবে বলা হবে যে, যে বিদ'আত ভ্রষ্টতা, তা হ'ল দ্বীনের বিষয়ে নবাবিস্কৃত বস্তু। এক্ষণে দুনিয়াবী বিষয়ে এটি কখনো সিদ্ধ, আবার কখনো নিষিদ্ধ, যে বিষয়ে কিছু পূর্বেই আমরা ইঙ্গিত করে এসেছি। এটি খুবই প্রসিদ্ধ বিষয়। যার জন্য উদাহরণের প্রয়োজন নেই।

ধরুন যে ব্যক্তি হজ্জের সফরে বিমানে ভ্রমণ করেন, নিঃসন্দেহে তা সিদ্ধ। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি বিমানে চড়ে পাশ্চাত্য দেশ সমূহে গমন করে ও সেখানকার সংকল্প করে, নিঃসন্দেহে তা পাপকর্ম। এরূপ অন্যান্য বিষয়।

অতঃপর দ্বীনী বা উপাসনাগত বিষয়সমূহ সম্পর্কে যদি প্রশ্নকারীকে জিজ্ঞেস করা হয় যে, কেন আপনি এগুলি করেন? জবাবে তিনি বলবেন, আল্লাহ্‌র নৈকট্য হাছিলের জন্য। তখন আমি বলব, আল্লাহ্‌র নৈকট্য হাছিলের কোন পথ নেই আল্লাহ্‌র দেখানো পথ ব্যতীত। আমি একটি কথা স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ 'প্রত্যেক নবোদ্ভূত বস্তুই ভ্রষ্টতা' এই মূলনীতিকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য আমার ধারণা মতে এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যে, لا مجال لاستحسان عقلي بتاتا 'শরী'আত বিষয়ে জ্ঞানগত ইস্তেহসান অর্থাৎ আমার জ্ঞান যেটাকে ভাল মনে করে সেটাই করব, এরূপ কথা বলার আদৌ কোন সুযোগ নেই'। এজন্য বিগত কোন বিদ্বান বলেছেন, ما أحدثت بدعة إلا وأميتت سنة 'যখন একটি বিদ'আতের উদ্ভব হয়, তখনই একটি সুন্নাত মিটে যায়'। বিদ'আতের বিষয়ে তালাশী চালাতে গিয়ে বিষয়টির বাস্ত

বতা আমি নিজ চোখে প্রত্যক্ষ করেছি। কিভাবে মানুষ বিভিন্ন সময়ে রাসূলের আনীত শরী'আতের বিরোধিতা করে যাচ্ছে।

গভীর ইল্‌ম ও মর্যাদার অধিকারী ব্যক্তিগণের কেউ যখন তেলাওয়াতের জন্য কুরআন হাতে নেন, আপনি তাদেরকে চুমু খেতে দেখবেন না। তারা কুরআন অনুযায়ী আমল করে থাকেন। পক্ষান্তরে সাধারণ মানুষ যাদের ভালোবাসার কোন নিয়ম-নীতি নেই- তারা বলবে, এতে আর এমন কি? অথচ তারা কুরআনের বিধানের উপরে আমল করে না। অতএব আমরা বলব, 'যখন একটি বিদ'আতের উদ্ভব হয়, তখনই একটি সুন্নাত মিটে যায়'।

এই বিদ'আতের অনুরূপ আরেকটি বিদ'আত হ'লঃ আমরা লোকদের দেখি এমনকি ঐসব ফাসেকদের, যাদের অন্তরে ঈমানের তলানিটুকুই কেবল অবশিষ্ট আছে, যখন তারা আযান শুনতে পায়, অমনি উঠে দাঁড়ায়। যদি আপনি তাকে জিজ্ঞেস করেন, দাঁড়ালেন কেন? সে বলবে تعظيمًا لله عز و جل 'মহান আল্লাহ্‌র সম্মানে'। অথচ তারা মসজিদে যাবে না। তারা তাদের তাস, পাশা, জুয়া ইত্যাদি খেলা নিয়ে মত্ত থাকবে। কিন্তু তারা ধারণা করে যে, এই দাঁড়ানোর মাধ্যমে আমরা আমাদের প্রভুকে সম্মান করলাম। দাঁড়ানোর এই রীতি এল কোত্থেকে? এসেছে সেই ভিত্তিহীন জাল হাদীছের অনুসরণে إِذَا سَمِعْتُمُ الْأَذَانَ فَقُوْمُوْا 'যখন তোমরা আযান শুনবে, তখন দাঁড়িয়ে যাবে'।[১৯]

উক্ত হাদীছটির একটি ভিত্তি রয়েছে। কিন্তু তা কিছু যঈফ ও মিথ্যা হাদীছ রচনাকারীদের দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে। অত্র হাদীছে বর্ণিত قُوْمُوْا 'তোমরা দাঁড়াও' শব্দটি তারা ছহীহ হাদীছে বর্ণিত قُوْلُوْا 'তোমরা বল' শব্দ থেকে 'বদল' করেছে (অর্থাৎ 'লাম'-কে 'মীম' বানিয়েছে)। সংক্ষেপে ছহীহ হাদীছটি হ'লঃ إِذَا سَمِعْتُمُ الْأَذَانَ فَقُوْلُوْا مِثْلَ مَا يَقُوْلُ ثُمَّ صَلُّوْا عَلَيَّ 'যখন তোমরা আযান শোন, তখন তোমরা বল যেমন মুওয়াযযিন বলেন। অতঃপর আমার উপরে দরূদ পাঠ কর'...।[২০]

---

১৯. *আবু নু'আইম ২/১৭৪ পৃঃ; সিলসিলা যঈফাহ হা/৭১১।*

২০. *মুসলিম, মিশকাত হা/৬৫৭, 'ছালাত' অধ্যায়, 'আযান ও আযানের জওয়াব দানের ফযীলত' অনুচ্ছেদ।*

এঘটনায় তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ, শয়তান কিভাবে মানুষের জন্য বিদ'আতকে সুন্দরভাবে পেশ করেছে। আর তাকে আশ্বস্ত করেছে এই বলে যে, সে একজন ঈমানদার। সে আল্লাহ্‌র নিদর্শন সমূহকে সম্মান করে। তার প্রমাণ হ'ল এই যে, সে যখন কুরআন হাতে নেয়, তখন তাতে চুম্বন দেয় এবং যখন আযান শোনে, তখন তার সম্মানে উঠে দাঁড়ায়!!

কিন্তু প্রশ্ন হ'লঃ ঐ ব্যক্তি কি কুরআনের উপর আমল করে? না। সে কুরআনের উপর আমল করে না। উদাহরণ স্বরূপঃ ঐ ব্যক্তি ছালাত আদায় করে। কিন্তু সে কি হারাম খায় না? সেকি সূদ খায় না? সে কি সূদ খাওয়ায় না? সে কি ঐসব প্রচার মাধ্যমের প্রসার ঘটায় না, যার দ্বারা জনগণের মধ্যে আল্লাহ্‌র অবাধ্যতা বৃদ্ধি পায়? এরূপ প্রশ্নের কোন শেষ নেই। সেকারণ আমরা আল্লাহ যেসব সৎকর্ম ও ইবাদাত সমূহ আমাদের জন্য বিধিবদ্ধ করেছেন, তার উপরে দৃঢ় থাকি। তার উপরে একটি হরফও বৃদ্ধি করি না। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেছেন, مَا تَرَكْتُ شَيْئًا مِمَّا أَمَرَكُمُ اللهُ بِهِ إِلاَّ وَقَدْ أَمَرْتُكُمْ بِهِ 'আল্লাহ তোমাদেরকে যা কিছু নির্দেশ দান করেছেন, তার কোন কিছুই আমি তোমাদের নির্দেশ দিতে ছাড়িনি'।[২১]

অতএব এখন এই যে কাজ তুমি করছ, এর দ্বারা কি তুমি আল্লাহ্‌র নৈকট্য কামনা করো? যদি জবাব হয়- হাঁ, তাহ'লে তার দলীল রাসূলের কাছ থেকে নিয়ে এস। অথচ এর জবাব এই যে, সেখানে এর কোন দলীল নেই। তাহ'লে এটি বিদ'আত! আর প্রত্যেক বিদ'আতই ভ্রষ্টতা। প্রত্যেক ভ্রষ্টতার পরিণাম জাহান্নাম।

কেউ যেন এ বিষয়ে সমস্যায় না পড়ে এবং বলে যে, এ মাসআলাটি তো একটি নিম্নস্তরের মাসআলা। এতদসত্ত্বেও এটি ভ্রষ্টতা? এবং এই বিদ'আতকারী ব্যক্তি জাহান্নামী হবে? একথার জবাব দিয়েছেন ইমাম শাত্বেবী। তিনি বলেছেন, كل بدعة مهما كانت صغيرة فهى ضلالة 'প্রত্যেক বিদ'আত তা যতই ছোট হৌক না কেন তা ভ্রষ্টতা।'

এখানে ভ্রষ্টতার হুকুমটির দিকে দেখা হবে না, দেখা হবে এর স্থানের দিকে, যে স্থানে বিদ'আতটি সৃষ্টি করা হয়েছে। আর তা হ'ল ইসলামী শরী'আত। যা

---

২১. *ত্বাবারাণী, আল-মু'জামুল কাবীর, হা/১৬৪৭; আহমাদ ৫/১৫৩,১৬২; ছহীহাহ হা/১৮০৩।*

সম্পূর্ণ ও পরিপূর্ণ হয়ে গেছে। অতএব ছোট হৌক বড় হৌক কোনরূপ বিদ‘আত সংযোজনের কোন সুযোগ সেখানে নেই। এখান থেকেই বিদ‘আতের ভ্রষ্টতা এসেছে। কেবল নতুন উদ্ভবের কারণে নয়। বরং এর দ্বারা আল্লাহ ও রাসূলের দেয়া বিধান সমূহের উপরে সংশোধনী আরোপ করা হয়।

প্রশ্ন-৯ : আমাদের উপরে কুরআনুল কারীমের তাফসীর কিভাবে করা ওয়াজিব?

উত্তর : আল্লাহ পাক কুরআনুল কারীম নাযিল করেছেন তাঁর রাসূল মুহাম্মাদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের) কল্বের উপরে, মানুষকে কুফর ও মূর্খতার অন্ধকার থেকে ইসলামের আলোর পথে বের করে আনার জন্য। যেমন আল্লাহ বলেন,

الر، كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّوْرِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيْزِ الْحَمِيْدِ- (إبراهيم ١-٢)-

(১) ‘আলিফ-লাম-রা’ (২) এই কিতাব যাকে আমরা আপনার প্রতি নাযিল করেছি, যাতে আপনি মানুষকে অন্ধকার থেকে আলোর পথে বের করে আনেন, তাদের পালনকর্তার নির্দেশ মতে, মহা পরাক্রান্ত ও মহা প্রশংসিতের পথের দিকে’ *(ইবরাহীম ১৪/১-২)*।

অতঃপর আল্লাহ তাঁর রাসূলকে কুরআনের বিষয়বস্তু সমূহের ব্যাখ্যাকারী, খোলাছাকারী ও স্পষ্টকারী বানিয়েছেন। যেমন তিনি বলেন, وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ- ‘আর আমরা আপনার প্রতি স্মরণিকা নাযিল করেছি, যাতে আপনি মানুষকে ব্যাখ্যা করে দেন যা তাদের উদ্দেশ্যে নাযিল করা হয়েছে এবং যাতে তারা চিন্তা-গবেষণা করে’ *(নাহল ১৬/৪৪)*।

অতঃপর ‘সুন্নাহ’ এসেছে কুরআনের বিষয়বস্তুকে খোলাছাকারী ও ব্যাখ্যাকারী হিসাবে। যেটা আল্লাহ্‌র নিকট থেকে ‘অহি’ হিসাবে এসেছে। যেমন আল্লাহ বলেন, وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى- إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يُّوْحَى- ‘তিনি খেয়াল-খুশীমত কথা বলেন না।’ ‘এটি কিছুই নয় অহি ব্যতীত যা তাঁর নিকটে করা হয়’ *(নাজম ৫৩/৩-৪)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

أَلاَ إِنِّى أُوْتِيْتُ الْقُرْآنَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ، أَلاَ يُوْشِكُ رَجُلٌ شَبْعَانُ عَلَى أَرِيْكَتِه يَقُوْلُ: عَلَيْكُمْ بِهَذَا الْقُرْآنِ، فَمَا وَجَدْتُّمْ فِيْهِ مِنْ حَلاَلٍ فَأَحِلُّوْهُ وَمَا وَجَدْتُّمْ فِيْهِ مِنْ حَرَامٍ فَحَرِّمُوْهُ، وَإِنَّ مَاحَرَّمَ رَسُوْلُ اللهِ كَمَا حَرَّمَ اللهُ- رواه ابو داؤد-

‘শুনে রাখ, আমি কুরআন প্রাপ্ত হয়েছি এবং তার সাথে তারই মত আরেকটি বস্তু। সাবধান! সত্বর কিছু আরামপ্রিয় লোককে দেখা যাবে, যারা পালংকের উপর ঠেস দিয়ে বলবে, তোমাদের জন্য এই কুরআনই যথেষ্ট। এখানে তোমরা যা হালাল পাও, তাকে হালাল মনে কর। আর যা হারাম পাও, তাকে হারাম মনে কর। অথচ নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌র রাসূল যা হারাম করেন, তা অনুরূপ যেমন আল্লাহ হারাম করেন’।[22]

এক্ষণে কুরআন তাফসীর করার জন্য প্রথম যে বস্তু প্রয়োজন, তাহ’ল ‘সুন্নাহ’। আর তা হ’ল, রাসূলের কথা, কর্ম ও মৌন সম্মতি সমূহ। এরপরে বিদ্বানগণের ব্যাখ্যা। আর এঁদের শীর্ষে রয়েছেন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ছাহাবীগণ। যাদের মধ্যে অগ্রগণ্য হ’লেন আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ)। এর কারণ একদিকে তিনি ছিলেন রাসূলের প্রথম যুগের সাথী। অন্যদিকে বিভিন্ন প্রশ্নের মাধ্যমে কুরআন বুঝা ও তার তাফসীরের ব্যাপারে তাঁর বিশেষ আগ্রহের কারণে। এরপর হ’লেন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস, যাঁর সম্পর্কে ইবনু মাসঊদ (রাঃ) বলেন, إنه ترجمانُ القران ‘তিনি হ’লেন কুরআনের মুখপাত্র’। অতঃপর যেকোন ছাহাবী, যার থেকে কোন আয়াতের তাফসীর প্রমাণিত হয়েছে এবং সে বিষয়ে ছাহাবীগণের মধ্যে কোন মতভেদ নেই, আমরা খুশীর সাথে এবং আত্মসমর্পণ ও কবুল করার মন নিয়ে ঐ তাফসীর বরণ করে নেব। আর যদি সেটা না পাওয়া যায়, আমাদের উপরে তখন ওয়াজিব হবে তাবেঈগণের ব্যাখ্যা গ্রহণ করা। যারা আল্লাহ্‌র রাসূলের ছাহাবীগণের কাছ থেকে তাফসীর শিক্ষা করেছেন। যেমন সাঈদ ইবনে জুবায়ের, ত্বাঊস প্রমুখ। যাঁরা বিভিন্ন ছাহাবী বিশেষ করে ইবনু আব্বাস (রাঃ)-এর কাছ থেকে তাফসীর শিক্ষায় প্রসিদ্ধি অর্জন করেছেন।

দুঃখের বিষয়, কোন কোন আয়াতের তাফসীর নিজস্ব রায় ও মাযহাব অনুযায়ী করা হয়েছে। যে বিষয়ে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ) থেকে সরাসরি কোন ব্যাখ্যা

---

২২. *আবুদাঊদ, মিশকাত হা/১৬৩; ‘ঈমান’ অধ্যায় ‘কিতাব ও সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরা’ অনুচ্ছেদ।*

আসেনি। পরবর্তী যুগের কিছু বিদ্বান ঐসব আয়াতের তাফসীর নিজ নিজ মাযহাবের সমর্থনে করেছেন। যা অত্যন্ত ভয়ংকর বিষয়। অথচ তাফসীরবিদগণ উক্ত মাযহাবের বিপরীত তাফসীর করেছেন।

আমরা এখানে উদাহরণ স্বরূপ একটি আয়াতের তাফসীর উল্লেখ করতে পারি। যেমন আল্লাহ বলেন, فَاقْرَؤُوْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ ‘তোমরা কুরআন থেকে যা সহজ মনে কর, তা পাঠ কর’ *(মুযযাম্মিল ৭৩/২০)*। কোন একটি মাযহাবে এর তাফসীর করা হয়েছে স্রেফ কুরআন পাঠ হিসাবে। অর্থাৎ প্রত্যেক ছালাতে ওয়াজিব হ’ল কুরআন থেকে কিছু অংশ পাঠ করা। যা হবে একটি দীর্ঘ আয়াত অথবা তিনটি ছোট আয়াত। তারা এটা বলেছেন, রাসূলের এ ছহীহ হাদীছ থাকা সত্ত্বেও যে, لَاصَلٰوةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ‘ছালাত হয় না ঐ ব্যক্তির, যে সূরা ফাতেহা পাঠ করে না’।[২৩] অন্য হাদীছে এসেছে, مَنْ صَلَّى صَلاَةً لَمْ يَقْرَأْ فِيْهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَهِيَ خِدَاجٌ فَهِيَ خِدَاجٌ فَهِيَ خِدَاجٌ غَيْرُ تَمَامٍ– ‘যে ব্যক্তি ছালাতে সূরা ফাতিহা পাঠ করল না, তার ছালাত বিকলাঙ্গ, বিকলাঙ্গ, বিকলাঙ্গ- অসম্পূর্ণ।[২৪]

বর্ণিত আয়াতটির তাফসীরে এ দু’টি হাদীছকে প্রত্যাখ্যান করার যুক্তি হিসাবে বলা হয় যে, উক্ত আয়াতে স্রেফ কুরআন পাঠের কথা বলা হয়েছে। তাদের নিকটে মুতাওয়াতির হাদীছ ব্যতীত কুরআনের ব্যাখ্যা জায়েয নয়। অর্থাৎ মুতাওয়াতিরের তাফসীর মুতাওয়াতির ভিন্ন করা যাবে না। ফলে তারা উপরোক্ত দু’টি হাদীছকে প্রত্যাখ্যান করেছেন নিজেদের রায় অথবা মাযহাবের ভিত্তিতে কৃত উক্ত আয়াতের তাফসীরের উপরে নির্ভর করার কারণে।

অথচ প্রথম দিকের ও পরবর্তীকালের সকল তাফসীর বিশেষজ্ঞ বিদ্বান উক্ত আয়াতের উদ্দেশ্য বর্ণনা করেছেন যে, فَاقْرَءُوْا اي فَصَلُّوْا مَا تَيَسَّرَ لَكُمْ مِنْ صَلاَةِ اللَّيْلِ ‘তোমরা পাঠ কর’ অর্থ ‘তোমরা ছালাত আদায় কর তোমাদের

২৩. *ছহীহুল জামে‘ হা/৭৩৮৯; মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৮২২; ‘ছালাতে ক্বিরাআত’ অনুচ্ছেদ।*

২৪. *ছিফাতুছ ছালাত পৃঃ ৯৭; মুসলিম, মিশকাত হা/৮২৩।*

সহজমত রাত্রির ছালাত’। কেননা মহান আল্লাহ এই আয়াতটি বর্ণনা করেছেন নিম্নোক্ত আয়াতের সাথে সম্পর্কিত করে,

إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُوْمُ أَدْنَى مِنْ ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِيْنَ مَعَكَ وَاللهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارِ، إِلَى أَنْ قَالَ: فَاقْرَءُوْا مَاتَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ–

অনুবাদ: নিশ্চয়ই আপনার পালনকর্তা জানেন যে, আপনি ও আপনার সাথী একটি দল রাত্রিতে ছালাতে দণ্ডায়মান হন প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ বা অর্ধাংশ বা এক তৃতীয়াংশ ব্যাপী। আর আল্লাহ রাত্রি ও দিবসের পরিমাণ নির্ধারণ করে থাকেন’। এখান থেকে বর্ণিত আয়াতাংশ পর্যন্ত فَاقْرَءُوْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنَ অর্থাৎ فَصَلُّوْا مَاتَيَسَّرَ لَكُمْ مِنْ صَلاَةِ اللَّيْلِ ‘অতএব তোমরা ছালাত আদায় কর তোমাদের সহজ মত রাত্রির (নফল) ছালাত’। বিশেষ করে রাত্রির ছালাতে মুছল্লীর জন্য ক্বিরাআতের পরিমাণ কতটুকু হবে, আয়াতটি সে বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত নয়। বরং আল্লাহ এর দ্বারা উম্মতের জন্য সহজ করে দিয়েছেন যেন তারা তাদের সহজ মত সময় ধরে রাত্রির ছালাত আদায় করে। তাদের উপরে ওয়াজিব নয় এগারো রাক‘আত পড়া, যা আপনারা জানেন যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) পড়তেন।

বস্তুতঃ এটাই হ’ল আয়াতের অর্থ। আর এটাই হ’ল আরবী ভাষারীতি যে, অংশের দ্বারা সমষ্টির অর্থ নেওয়া হয়ে থাকে।[২৫]

অতএব আল্লাহ্‌র বাণী فَاقْرَءُوْا ‘পাঠ কর’ অর্থ فَصَلُّوْا ‘ছালাত আদায় কর’। এখানে ‘ছালাত’ (الصلاة) হ’ল ‘সমষ্টি’ (الكل) এবং ‘ক্বিরাআত’ (القراءة) হ’ল ‘অংশ’ (الجزء)। যেমন অন্যত্র আল্লাহ বলেন, أَقِمِ الصَّلاَةَ لِدُلُوْكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ ‘তুমি ছালাত কায়েম কর সূর্য ঢলে পড়া হ’তে রাত্রির প্রথম অন্ধকার পর্যন্ত এবং ফজরের কুরআন’ *(বনু ইস্রাঈল ১৭/৭৮)*। এখানে

২৫. *যেমন আল্লাহ বলেন,* يَوْمَ يَنظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ *‘যেদিন মানুষ প্রত্যক্ষ করবে তার দু’হাত যা অগ্রিম প্রেরণ করেছে’ (নাবা ৭৮/৪০)। এখানে দু’হাত বলে ‘ব্যক্তি’কে বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ দেহের একটি অংশের কথা উল্লেখ করে দেহধারী ব্যক্তিকে বুঝানো হয়েছে। -অনুবাদক]*

'ফজরের কুরআন' (قُرْآنَ الْفَجْرِ) অর্থ 'ফজরের ছালাত' (صلاة الفجر)। এখানে অংশ বর্ণনা করে সমষ্টি বুঝানো হয়েছে। আরবী ভাষার এ বাকরীতি খুবই পরিচিত।

অতএব আলোচ্য আয়াতের তাফসীর প্রকাশিত হওয়ার পর, যে তাফসীরে বিগত ও পরবর্তী যুগের কোন তাফসীরবিদের মধ্যে মতভেদ নেই, প্রথম ও দ্বিতীয় হাদীছটি স্রেফ 'আহাদ'[২৬] হওয়ার দাবী তুলে প্রত্যাখ্যান করা সিদ্ধ নয়, এ যুক্তিতে যে, 'আহাদ' পর্যায়ের হাদীছ দ্বারা কুরআনের তাফসীর করা জায়েয নয়। কেননা বর্ণিত আয়াতটি তাফসীর করা হয়েছে কুরআনের ভাষা সম্পর্কে গভীর তত্ত্ব জ্ঞানের অধিকারী বিদ্বানগণের বক্তব্য সমূহের মাধ্যমে- এটা হ'ল প্রথম কথা। দ্বিতীয় এজন্য যে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর হাদীছ কুরআনের বিরোধী নয়; বরং তা কুরআনকে ব্যাখ্যা করে ও স্পষ্ট করে। যা আমরা এই আলোচনার শুরুতে উল্লেখ করেছি। অতএব এটা কিভাবে বলা যেতে পারে? অথচ আয়াতের সঙ্গে এ বিষয়ের কোন সম্পর্কই নেই যে, মুসলমানের জন্য তার ছালাতে চাই তা ফরয হৌক বা নফল হৌক, কতটুকু ক্বিরাআত করা ওয়াজিব হবে।

এক্ষণে উপরে বর্ণিত দু'টি হাদীছের বিষয়বস্তু পরিষ্কার যে, মুছল্লীর ছালাত শুদ্ধ হবে না সূরা ফাতেহা পাঠ করা ব্যতীত। হাদীছ দু'টি হ'ল, (১) لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ 'ছালাত হয় না যে ব্যক্তি সূরা ফাতেহা পাঠ করে না' (২) مَنْ صَلَّى صَلاَةً لَمْ يَقْرَأْ فِيْهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَهِىَ خِدَاجٌ فَهِىَ خِدَاجٌ فَهِىَ خِدَاجٌ غَيْرُ تَمَامٍ– 'যে ব্যক্তি ছালাতে সূরা ফাতিহা পাঠ করল না, তার ছালাত বিকলাঙ্গ, বিকলাঙ্গ, বিকলাঙ্গ', অপূর্ণাঙ্গ। অর্থাৎ ত্রুটিপূর্ণ (وهى ناقصة)। এমতাবস্থায় যে ব্যক্তি ত্রুটিপূর্ণভাবে ছালাত শেষ করল, সে ছালাত আদায় করল না। ঐ ছালাত তার বাতিল হ'ল। যা প্রথম হাদীছটি থেকে পরিষ্কার বুঝা যায়।

২৬. *'আহাদ' ঐ হাদীছকে বলে যার বর্ণনাকারীর সংখ্যা এক বা দু'জন। যেমন হযরত ওমর (রাঃ) বর্ণিত প্রসিদ্ধ হাদীছ 'সকল কাজ নিয়তের উপর নির্ভরশীল'। -অনুবাদক।*

এই প্রকৃত অবস্থা যখন আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে গেল, তখন আমাদের নিশ্চিন্ত মনে রাসূলের হাদীছ সমূহের দিকে ফিরে যাওয়া উচিত, প্রথমতঃ যা হাদীছের কিতাবসমূহে বর্ণিত হয়েছে এবং দ্বিতীয়তঃ যা বিশুদ্ধ সূত্র সমূহে বর্ণিত হয়েছে। সেখানে নতুন নতুন থিওরী বের করে আমরা অহেতুক সন্দেহবাদ আরোপ করব না, যেরূপ এ যামানায় করা হচ্ছে। আর তা হ'ল যেমন কেউ বলেন, 'আহকাম' বিষয় ব্যতীত 'আক্বীদা' বিষয়ে আমরা 'আহাদ' পর্যায়ের হাদীছের পরোয়া করি না। 'আহাদ' হাদীছের উপরে আক্বায়েদের ভিত্তি হ'তে পারে না। এভাবেই তারা কল্পনা করে থাকেন। অথচ আমরা জানি যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আহলে কিতাব (ইহুদী-নাছারাদের) নিকটে মু'আয (রাঃ)-কে পাঠিয়েছিলেন তাদেরকে তাওহীদের দাওয়াত দেওয়ার জন্য'।[২৭] অথচ তিনি ছিলেন একক ব্যক্তি।

'কুরআনুল কারীমের তাফসীর কিভাবে করা আমাদের উপরে ওয়াজিব' এ বিষয়ের জন্য পূর্বোক্ত আলোচনাই যথেষ্ট বলে আমি মনে করি।

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين–

'আল্লাহ শান্তি ও সমৃদ্ধি নাযিল করুন আমাদের নবী মুহাম্মাদ ও তাঁর পরিবারবর্গ ও ছাহাবীগণের উপর এবং ক্বিয়ামত পর্যন্ত যারা তাঁদের অনুসারী হবেন তাদের সকলের উপর। সকল প্রশংসা বিশ্ব চরাচরের পালনকর্তা আল্লাহ্র জন্য'।

سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا انت استغفرك وأتوب إليك–

اللهم اغفرلى ولوالدىّ وللمؤمنين يوم الحساب–

সুন্নাতের রাস্তা ধরে নির্ভয়ে চল হে পথিক!
জান্নাতুল ফেরদৌসে সিধা চলে গেছে এ সড়ক

২৭. *বুখারী হা/১৪৫৮; মুসলিম হা/১৯; মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৭৭২ 'যাকাত' অধ্যায়।*